ফেলুদা সমগ্র

গোলকধাম রহস্য

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. জয়দ্রথ কে ছিল 2
২. সাতের এক বালিগঞ্জ পার্ক. 12
৩. নীহারবাবুর ঘর 18
৪. শব্দভেদী বাণ 47

১. জয়দ্রথ কে ছিল

জয়দ্রথ কে ছিল?

দুর্যোধনের বোন দুঃশলার স্বামী। i

অস্ত্র জরাসন্ধ?

মগধের রাজা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন?

দ্রৌপদীর দাদা।

অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরের শাঁখের নাম কী?

অর্জ্জুনের দেবদত্ত, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়।

কোন অস্ত্র ছুড়লে শত্রুরা মাথা গুলিয়ে সেমসাইড করে বসে?

ত্বাষ্ট্র!

ভেরি গুড!

যাক বাবা, পাশ করে গেছি! ইদানীং রামায়ণ-মহাভারত হল ফেলুদার যাকে বলে স্টেপল রিডিং। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমিও পড়ছি। আর তাতে কোনও আপশোস নেই। এ তো আর ওষুধ গেলা না, এ হল একধার থেকে ননস্টপ ভূরিভোজ। গল্পের পর গল্পের পর গল্প! ফেলুদা বলে ইংরেজিতে বইয়ের বাজারে আজকাল একটা বিশেষণ চালু হয়েছে– আনপুটডাউনেবুল। যে বই একবার পড়ব বলে পিক-আপ করলে আর পুট ডাউন করবার

জো নেই। রামায়ণ-মহাভারত হল সেইরকম আনপুটডাউনেবল। ফেলুদার হাতে এখন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড। আমারটা অবিশ্যি কিশোর সংস্করণ। লালমোহনবাবু বলেন, ওঁর নাকি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকখানি মুখস্থ, ওঁর ঠাকুমা পড়তেন, সেই শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ নেই; ভাবছি। একটা জোগাড় করে জটায়ুর স্মরণশক্তিটা পরীক্ষা করে দেখব। ভদ্রলোক আপাতত ঘরবন্দি অবস্থায় পুজোর উপন্যাস লিখছেন, তাই দেখা-সাক্ষাৎটা একটু কম।

বই থেকে মুখ তুলে রাস্তার দরজাটার দিকে চাইতে হল ফেলুদাকে। কলিং বেল বেজে উঠেছে। হিজলীতে একটা খুনের রহস্য সমাধান করে গত শুক্রবার ফিরেছে ফেলুদা। এখন আয়েশের মেজাজ, তাই বোধহয় বেলের শব্দে তেমন আগ্রহ দেখাল না। ও যা পারিশ্রমিক নেয় তাতে মাসে একটা করে কেস পেলেই ওর দিব্যি চলে যায়। জটায়ুর ভাষায় ফেলুদার জীবনযাত্রা সেন্ট পার্সেন্ট অনাড়ম্বর। এখানে বলে রাখি, জটায়ুর জিভের সামান্য জড়তার জন্য অনাড়ম্বরটা মাঝে মাঝে অনারম্বড়ি হয়ে যায়। সেটা শোধরাবার জন্য ফেলুদা ওঁকে একটা সেনটেন্স গড়গড় করে বলা অভ্যোস করতে বলেছিল; সেটা হল–বারো হাঁড়ি রাবাড়ি বড় বাড়াবাড়ি। ভদ্রলোক একবার বলতে গিয়েই চারবার হোঁচট খেয়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে, নতুন চরিত্র যখন আসবে, তখন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে দিবি। তুই না দিলে পাঠক নিজেই একটা চেহারা কল্পনা করে নেবে; তারপর হয়তো দেখবে যে তোর বর্ণনার সঙ্গে তার কল্পনার অনেক তফাত। তাই বলছি, ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁর রং ফরসা, হাইট আন্দাজ পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি, বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, কানের দুপাশের চুল পাকা, থুতনির মাঝখানে একটা আচিল, পরনে ছাই রঙের সাফারি সুট। ঘরে ঢুকে যেভাবে গলা খাঁকরালেন তাতে একটা ইতস্তক ভাব ফুটে ওঠে, আর খাঁকরানির সময় ডানহাতটা মুখের কাছে উঠে আসাতে মনে হল ভদ্রলোক একটু সাহেবভাবাপন্ন।

সরি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে পারিনি, সাফার এক পাশে বসে বললেন আগন্তুক–আমাদের ওদিকে রাস্তা খোঁড়াখুড়িতে লাইনগুলো সব ডেড।

ফেলুদা মাথা নাড়ল। খোঁড়াখুড়িতে শহরের কী অবস্থা সেটা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

আমার নাম সুবীর দত্ত।–গলার স্বরে মনে হয় দিব্যি টেলিভিশনে খবর পড়তে পারেন। ইয়ে, আপনিই তো প্রাইভেট ইনভেস–

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি এসেছি আমার দাদার ব্যাপারে।

ফেলুদা চুপ। মহাভারত বন্ধ অবস্থায় তার কোলের উপরে, তবে একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল গোঁজা রয়েছে।

অবিশ্যি তার আগে আমার পরিচয়টা একটু দেওয়া দরকার। আমি করবেট অ্যান্ড নরিস কোম্পানিতে সেলস এগজিকিউটিভ। ক্যামাক স্ট্রিটের দীনেশ চৌধুরীকে বোধহয় আপনি চেনেন; উনি আমার কলেজের সহপাঠী ছিলেন।

দীনেশ চৌধুরী ফেলুদার একজন মক্কেল সেটা জানতাম।

আই সি ভীষণ সাহেবি কায়দায় গভীর গলায় বলল ফেলুদা। ভদ্রলোক এবার তাঁর দাদার কথায় চলে গেলেন–

দাদা এককালে বায়োকেমিস্ট্রিতে খুব নাম করেছিলেন। নীহার দত্ত। ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। এখানে নয়, আমেরিকায়। মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটিতে। ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে। করতে একটা এক্সপ্লোশন হয়। দাদার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়; কিন্তু শেষে

ওখানকারই হাসপাতালের এক ডাক্তার ওঁকে বাঁচিয়ে তোলে। তবে চোখ দুটোকে বাঁচানো যায়নি।

অন্ধ হয়ে যান?

অন্ধ। সেই অবস্থায় দাদা দেশে ফিরে আসেন। ওখানে থাকতেই একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেন; অ্যাক্সিডেন্টের পর মহিলা দাদাকে ছেড়ে চলে যান। তারপর আর দাদা বিয়ে করেননি।

তাঁর গবেষণাও তো তা হলে শেষ হয়নি? না। সেই দুঃখেই হয়তা দাদা প্রায় মাস ছয়েক কারওর সঙ্গে কথা বলেননি। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শেষে ক্রমে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।

এখন কী অবস্থা?

বিজ্ঞানে এখনও উৎসাহ আছে সেটা বোঝা যায়। একটি ছেলেকে রেখেছেন—ওঁর হেলপার বা সেক্রেটারি বলতে পারেন—সেও বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল—তার একটা কাজ হচ্ছে সায়েন্স ম্যাগাজিন থেকে প্রবন্ধ পড়ে শোনানো। এমনিতে যে দাদা একেবারে হেলপলেস তা নন; বিকেলে আমাদের বাড়ির ছাতে একই লাঠি হাতে পায়চারি করেন। এমনকী বাড়ির বাইরেও রাস্তার মোড় পর্যন্ত একাই মাঝে মাঝে হেঁটে আসেন। বাড়িতে এঘর ওঘর করার সময় ওঁর কোনও সাহায্যের দরকার হয় না।

ইনকাম আছে কিছু? বায়োকেমিস্ট্রির উপর দাদার একটা বই বেরিয়েছিল। আমেরিকা থেকে, তার থেকে একটা রোজগার আছে।

ঘটনাটা কী?

আজ্ঞে?

মানে, আপনার এখানে আসার কারণটা...

বলছি।

পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন সুবীর দত্ত–

দাদার ঘরে কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল।

সেটা কী করে বুঝলেন?

ফেলুদা এতক্ষণে হাত থেকে মহাভারত নামিয়ে সামনের টেবিলের উপর রেখে প্রশ্নটা করল।

দাদা নিজে বোঝেননি। ওঁর চাকরিটাও যে খুব বুদ্ধিমান তা নয়। নটার সময় ওঁর সেক্রেটারি এসে ঘরের চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ডেস্কের দুটো দেরাজই আধাখোলা, কাগজপত্র কিছু মেঝেতে ছড়ানো, ডেস্কের উপরের জিনিসপত্র ওলট-পালট, এমনকী গোদরেজের আলমারির চাবির চারপাশে ঘষটানার দাগ; বাঝাই যায় কেউ আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছে।

আপনাদের পাড়ায় চুরি হয়েছে ইদানীং?

হয়েছে। আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে। পাড়ায় এখন দুটো পুলিশের লোক টহল দেয়। পাড়া বলতে বালিগঞ্জ পার্ক। আমাদের বাড়িটা প্রায় আশি বছরের পুরনো। ঠাকুরদার তৈরি। খুলনায় জমিদারি ছিল আমাদের। ঠাকুরদা চলে আসেন কলকাতায় এইটিন নাইনটিতে। রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ব্যবসা শুরু করেন। কলেজ স্ট্রিটে বড় দোকান ছিল আমাদের। বাবাও চালিয়েছিলেন কিছুদিন ব্যবসা। বছর ত্রিশেক আগে উঠে যায়।

আপনার বাড়িতে এখন লোক কজন? আগের তুলনায় অনেক কম। বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন। আমার স্ত্রীও, সেভেনটি ফাইভে। আমার দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বড় ছেলে জার্মানিতে। এখন মেম্বার বলতে আমি, দাদা, আর আমার ছোট ছেলে। দুটি চাকর আর একটি বান্নার লোক আছে। আমরা দোতলায় থাকি। একতলাটা দুভাগ করে ভাড়া দিয়েছি।

কারা থাকে। সেখানে?

সামনের ফ্ল্যাটটাতে থাকেন। মিঃ দস্তুর। ইলেকট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসা। পিছনে থাকেন। মিঃ সুখওয়ানি, অ্যান্টিকের দোকান আছে লিন্ডসে স্ট্রিটে।

এদের ঘরে চোর ঢোকেনি? শুনে তো বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়।

পয়সা তো আছেই। ফ্ল্যাটগুলোর ভাড়া আড়াই হাজার করে। সুখওয়ানির ঘরে দামি জিনিস আছে বলে ও দরজা বন্ধ করে শোয়। দস্তুর বলে বন্ধ ঘরে ওর সাফোকেশন হয়।

চোর আপনার দাদার ঘরে ঢুকেছিল কী নিতে অনুমান করতে পারেন?

দেখুন, দাদার অসমাপ্ত গবেষণার কাগজপত্র দাদার আলমারিতেই থাকে, আর সেগুলো যে অত্যন্ত মূল্যবান তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অবিশ্যি সাধারণ চার আর তার মূল্য কী বুঝবে। আমার ধারণা চার টাকা নিতেই ঢুকেছিল। অন্ধ লোকের ঘরে চুরির একটা সুবিধে আছে সেটা তো বুঝতেই পারেন?

বুঝেছি। বলল ফেলুদা অন্ধ মানে বোধহয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, কারণ চেক সই করা তো...

ঠিক বলেছেন। বই বাবদ দাদা যা টাকা পান সব আমার নামে আসে। আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। তারপর আমি চেক কেটে টাকা তুলে দাদাকে দিয়ে দিই। সেই ব্যাঙ্কের টাকা

সব ওই গোদরেজের আলমারিতেই থাকে। আমার আন্দাজ হাজার ত্রিশোক টাকা ওই আলমারিতে রয়েছে।

চাবি কোথায় থাকে?

যতদূর জানি, দাদার বালিশের নীচে। বুঝতেই পারছেন, দাদা অন্ধ বলেই দুশ্চিন্তা। রাত্তিরে দরজা খুলে শোন, চৌকাঠের বাইরে শোয় চাকর কৌমুদী–যাতে মাঝরাত্তিরে প্রয়োজনে ডাক দিলে আসতে পারে। ধরুন যদি তেমন বেপরোয়া চোর হয়, আর চাকরের ঘুম না ভাঙে, তা হলে তো দাদার আত্মরক্ষার কোনও উপায় থাকে না। অথচ পুলিশে উনি খবর দেবেন না। বলেন ওরা কেবল জানে জেরা করতে, কাজের বেলায় ঢু, সব ব্যাটা ঘুষখোর ইত্যাদি। তাই আপনার কথা বলতে উনি রাজি হলেন। আপনি যদি একবারটি আমাদের বাড়িতে আসেন, তা হলে অন্তত প্রিভেনশনের ব্যাপারে কী করা যায় সেটা একটু ভেবে দেখতে পারেন। এমনকী বাইরের চোর না। ভেতরের চোর সেটাও একবার–

ভেতরের চোর?

আমি আর ফেলুদা দুজনেই উৎকর্ণ মানে কান খাড়া।

ভদ্রলোক চুবুটের ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলে গলাটা যতটা পারা যায় খাদে নামিয়ে এনে বললেন, দেখুন মশাই, আমি স্পষ্টবক্তা। আপনার কাছে যখন এসেছি, তখন জানি ঢেকেঢুকে কথা বললে আপনার কোনও সুবিধে হবে না। প্রথমত আমাদের দুজন ভাড়াটের একটিকেও আমার খুব পছন্দ না। সুখওয়ানি এসেছে বছর তিনেক হল। আমি নিজে জানি না, কিন্তু যারা পুরনো আর্টের জিনিস-টিনিস কেনে তেমন লোকের কাছে শুনেছি সুখওয়ানি লোকটা সিধে। নয়। পুলিশের নজর আছে। ওর ওপর।

আর অন্য ভাড়াটো?

দস্তুর এসেছে মাস চারেক হল। ও ঘরটায় আমার বড় ছেলে থাকত সে পার্মানেন্টলি দেশের বাইরে। ডুসেলডর্ফে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করে জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছে। দস্তুর লোকটা সম্বন্ধে বদনাম শুনিনি। তবে সে এত অতিরিক্ত রকম চাপা যে সেটাই সন্দেহের কারণহয়ে দাঁড়ায়। আর, ইয়ে-

ভদ্রলোক থামলেন। তারপর বাকি কথাটা বললেন মুখ নামিয়ে, দৃষ্টি ছাইদানিটার দিকে রেখে।

শঙ্কর, আমার ছোট ছেলে, একেবারে সংস্কারের বাইরে চলে গেছে।

ভদ্রলোক আবার চুপ। ফেলুদা বলল, কত বড় ছেলে?

তেইশ বছর বয়স। গত মাসে জন্মতিথি গেল, যদিও তার মুখ দেখিনি সেদিন।

কী করে?

নেশা, জুয়া, ছিনতাই, গুণ্ডাগিরি কোনওটাই বাদ নেই। পুলিশের খপ্পরে পড়েছে তিনবার। আমাকেই গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের পরিবারের একটা খ্যাতি আছে সেটা তো বুঝতেই পারছেন, তাই নাম করলে এখনও কিছুটা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সে নাম আর কদ্দিন টিকবে জানি না।

চোর যেদিন আসে সেদিন ও বাড়িতে ছিল?

রাত্তিরে খেতে এসেছিল—সেটাও রোজ আসে না—তারপর আর দেখিনি। ঠিক হল আজই বিকেলে আমরা একবার যাব বালিগঞ্জ পার্কে। কেসটাকে এখনও ঠিক কেস বলা যায় না, কিন্তু আমি জানি বিস্ফোরণে অন্ধ হয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিকের ব্যাপারটা ফেলুদার মন টেনেছে। তার মাথায় নিশ্চয়ই ঘুরছে ধৃতরাষ্ট্র।

খবরের কাগজের কাটিং-এর বাইশ নম্বর খাতা থেকে মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে বিস্ফোরণে উদীয়মান বাঙালি জীবরসায়নিক নীহাররঞ্জন দত্ত-র চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবরটা খুঁজে বার করে দিতে সিধুজ্যাঠার লাগল সাড়ে তিন মিনিট। তার মধ্যে অবিশ্যি দুমিনিট গেল ফেলুদা অ্যাদ্দিন ডুব মেরে থাকার জন্য তাকে ধমকানিতে। সিধুজ্যাঠা আমাদের সত্যি জ্যাঠা না হলেও আত্মীয়ের বাড়া। কোনও অতীতের ঘটনার বিষয় জানতে হলে ফেলুদা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না গিয়ে সিধুজ্যাঠার কাছে যায়। তাতে কাজ হয় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আর অনেক বেশি ফুর্তিতে।

ফেলুদা প্রসঙ্গটা তুলতেই সিধুজ্যাঠা ভুরু কুঁচকে বললেন, নীহার দত্ত? যে ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিল? এক্সপ্লোশনে চোখ হারায়?

বাপরে বাপ!– কী স্মৃতিশক্তি! বাবা বলেন শ্রুতিধর। ফেলুদা বলে ফোটাগ্রাফিক মেমরি; একবার কোনও ইন্টারেস্টিং খবর পড়লে বা শুনলে তৎক্ষণাৎ মগজে চিরকালের মতো ছাপা হয়ে যায়।–কিন্তু সে তো একা ছিল না?

এ খবরটা নতুন।

একা ছিল না মানে? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

তার মানে, যদ্দূর মনে পড়েছে– সিধু জ্যাঠা ইতিমধ্যে তাঁর বুকশেলফের সামনে গিয়ে খবরের কাটিং-এর খাতা টেনে বার করেছেন– এই গবেষণায় তাঁর একজন পার্টনার ছিল– হ্যাঁ এই যে।

বাইশ নম্বর খাতার একটা পাতা খুলে সিধুজ্যাঠা খবরটা পড়লেন। ১৯৬২-র খবর। তাতে জানা গেল যে নীহার দত্তের গবেষণার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন আরেকটি বাঙালি বায়োকেমিস্ট, নাম সুপ্রকাশ চৌধুরী। অ্যাক্সিডেন্টে চৌধুরীর কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ সে ছিল ঘরের অন্য দিকে। এই চৌধুরীর জন্যই নাকি নীহার দত্ত নিশ্চিত মৃত্যুর

হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, কারণ আগুন নেবানো ও তৎক্ষণাৎ নীহার দত্তকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাটা চৌধুরীই করেন।

এই চৌধুরী এখন—?

তা জানি না, বললেন সিধু জ্যাঠা। সে খবর আমার কাছে পাবে না। এদের জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে যদি সেটা খবরের কাগজে স্থান পায় তবেই সেটা আমার নজরে আসে। আমি যেচে কারুর খবর নিই না। কী দরকার? আমার খবর কজন নেয় যে ওদের খবর আমি নেব? তবে এটা ঠিক যে, এই চৌধুরী যদি বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগানো একটা কিছু করত, তা হলে সে খবর আমি নিশ্চয়ই পেতাম।

২. সাতের এক বালিগঞ্জ পার্ক

সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের বাড়িতে যে বয়সের ছাপা পড়েছে সেটা আর বলে দিতে হয় না। এটাও ঠিক যে বাড়ির মালিকের যদি সে ছাপ ঢাকবার ক্ষমতা থাকত, তা হলে ঢাকা পড়ত নিশ্চয়ই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দত্ত পরিবারের অবস্থা এখন খুব একটা ভাল নয়। বাগানটা বোধহয় বাড়ির পিছন দিকে। সামনে একটা গোল ঘাসের চাকতির উপর একটা অকেজো ফোয়ারা, সেই গোলের দুপাশ দিয়ে নুড়িবেছানো রাস্তা চলে গেছে গাড়িবারান্দার দিকে। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে গোলোকধাম দেখে ফেলুদা কৌতুহল প্রকাশ করাতে সুবীরবাবু বললেন যে ওঁর ঠাকুরদাদার নাম ছিল গোলোকবিহারী দত্ত। বাড়িটা তিনিই তৈরি করেছিলেন।

লোকধাম যে এককালে দারুণ বাড়ি ছিল সেটা এখনও দেখলে বোঝা যায়। গাড়িবারান্দা থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে শ্বেতপাথরের বাঁধানা ল্যান্ডিং-এর বাঁদিক দিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সামনে একটা দরজা দিয়ে ভিতরে করিডর দেখা যাচ্ছে, তার ডান দিকে নাকি পর পর দুটো ফ্ল্যাট। বাঁ দিকে একটা প্রকাণ্ড হলঘর, যেটা দত্তরা ভাড়া দেননি। এই ঘরে নাকি এককালে অনেক খানাপিনা গানবাজন হয়েছে।

হলঘরের ঠিক ওপরেই হল দোতলার বৈঠকখানা। আমরা সেখানেই গিয়ে বসলাম। মাথার ওপর কাপড়ে মোড়া চিরকালের মতো অকেজো ঝাড়লণ্ঠন, তার যে কত ডালপালা তার ঠিক নেই। একদিকে দেয়াল গিল্ট-করা ফ্রেমে বিশাল আয়না, সুবীরবাবু বললেন সেটা বেলজিয়াম থেকে আনানো। মেঝেতে পুরু গালিচার এখানে ওখানে খুবলে গিয়ে দাবার ছকের মতো সাদা-কালো শ্বেতপাথরের মেঝেটা বেরিয়ে পড়েছে।

সুবীরবাবু সুইচ টিপে একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প জ্বলিয়ে দিতে ঘরের অন্ধকার খানিকটা দূর হল। আমরা সোফায় বসতে যাব, এমন সময় বাইরের করিডর থেকে একটা শব্দ পাওয়া গেল—খট্ খট্ খট্ খট্।

লাঠি আর চটি মেশানো শব্দ।

শব্দটা চৌকাঠের বাইরে এসে মুহূর্তের জন্য থামল; আর তার পরেই লাঠির মালিকের প্রবেশ। সেই সঙ্গে আমরা তিনজনেই দণ্ডায়মান।

অচেনা গলার আওয়াজ পেলাম—এঁরা এলেন বুঝি?

গভীর গলা, ছফুট লম্বা চেহারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। এনার চুল সব পাকা, কিছুটা এলোমেলো, চোখে কালো চশমা, পরনে আদির পাঞ্জাবি আর সিল্কের পায়জামা। বিস্ফোরণ যে শুধু চোখই নষ্ট করেনি, মুখের অন্যান্য অংশেও যে তার ছাপ রেখে গেছে, সেটা ল্যাম্পের চাপা। আলোতেও বোঝা যাচ্ছে।

সুবীরবাবু দাদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।—বাসো, দাদা।

বসছি। আগে এঁদের বসাও।

নমস্কার, ফেলুদা বলল, আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমার বাঁ পাশে আমার কাজিন তপেশ।

আমিও খাটা গলায় একটা নমস্কার বলে দিলাম। শুধু হাত জোড় করাটা তো অন্ধ লোকের কাছে মাঠে মারা যাবে।

আমারই মতো হাইট বলে মনে হচ্ছে মিত্তির মশাইয়ের, আর কাজিন বোধ করি পাঁচ সাত কি সাড়ে সাত।

আমি পাঁচ সাত, বলে ফেললেন তপেশরঞ্জন মিত্র।

মনে মনে ভদ্রলোকের আন্দাজের তারিফ না করে পারলাম না।

বসুন এবং বোসো বলে ভাইয়ের সাহায্য না নিয়েই আমাদের সামনের সোফায় বসে পড়লেন নীহার দত্ত। –চায়ের কথা বলেছ?

বলেছি, বললেন সুবীর দত্ত।

ফেলুদা অভ্যাসমতো ভনিতা না করে সোজা কাজের কথায় চলে গেল।

আপনি যে রিসার্চ করছিলেন, সে ব্যাপারে বাধ হয় আপনার একজন পার্টনার ছিল, তাই না?

সুধীরবাবুর উসখুসে ভাব দেখে বুঝলাম যে এ ব্যাপারটা তিনিও জানতেন, এবং আমাদের না বলার জন্য অপ্রস্তুত বোধ করেছেন।

পার্টনার নয়, বললেন নীহার দত্ত–অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপ্রকাশ চৌধুরী। সে আমেরিকাতেই পড়াশুনা করেছিল। পার্টনার বললে বেশি বলা হবে। আমাকে ছাড়া তার এগোনোর পথ ছিল না।

তিনি এখন কোথায় বা কী করছেন সে খবর জানেন?

না।

অ্যাক্সিডেন্টের পর তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি?

না।

এটুকু বলতে পারি যে তার একাগ্রতার অভাব ছিল। বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়াও অন্য পাঁচ রকম ব্যাপারে তার ইন্টারেস্ট ছিল।

বিস্ফোরণটা কি অসাবধানতার জন্য হয়?

আমি নিজে সজ্ঞানে কখনও অসাবধান হইনি।

চা এল। ঘরটা কেমন যেন থমথম করছে। সুবীরবাবুর দিকে আড়াচাখে দেখলাম। তাঁরও যেন তটস্থ ভাব। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমার দিকে।

চায়ের সঙ্গে শিঙাড়া আর রাজভোগ। আমি প্লেটটা হাতে তুলে নিলাম। ফেলুদার যেন খাওয়ার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই। ও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল––

আপনি যে ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেটা তা হলে অসমাপ্তই রয়ে গেছে!

সে দিকে কেউ অগ্রসর হলে খবর পেতাম নিশ্চয়ই।

সুপ্রকাশবাবু সে নিয়ে আর কোনও কাজ করেননি সেটা আপনি জানেন?

এটুকু জানি যে আমার নোটস ছাড়া তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। গবেষণার শেষপর্বের নোটস্ আমার কাছে ছিল আমার ব্যক্তিগত লকারে। তার নাগাল পাওয়া বাইরের কারোর সাধ্যি ছিল না। সে সব কাগজপত্র আমার সঙ্গেই দেশে ফিরে আসে, আমার কাছেই আছে। এটা জানি যে গবেষণা সফল হলে নোবেল প্রাইজ এসে যেত আমার হাতের মুঠোয়। ক্যানসারের চিকিৎসার একটা রাস্তা খুলে যেত।

ফেলুদা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছে। আমিও ইতিমধ্যে চুমুক দিয়ে বুঝেছি এ চা ফেলুদার মতো খুঁতখুঁতে লোককেও খুশি করবে। কিন্তু চুমুক দিয়ে তার মুখের অবস্থা কী হয় সেটা আর দেখা হল না।

ঘরের বাতি নিভে গেছে। লোডশেডিং। এক'দিন থেকে ঠিক এই সময়টাতেই যাচ্ছে, সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন সুবীরবাবু।–

কৌমুদী!

বাইরে এখনও অল্প আলো রয়েছে; সেই আলোতেই সুবীরবাবু চাকরের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। –

বাতি গেল বুঝি? প্রশ্ন করলেন নীহার দত্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এতে আমার কিছু এসে যায় না।

গ্র্যান্ডফাদার ক্লিকটা ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। ছ'টা।

সুবীরবাবু ফিরলেন, পিছনে মোমবাতি হাতে চাকর কৌমুদী।

মাঝের টেবিলে মোমবাতি রাখায় সকলের মুখ আবার দেখা যাচ্ছে। নীহারবাবুর কালো চশমার দুই কাচে দুটি কম্পমান হলদে বিন্দু। মোমবাতির শিখার ছায়া।

ফেলুদা চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে আবার চশমার দিকে চেয়ে বলল, আপনার গবেষণার নোটস যদি অন্য কোনও বায়োকেমিস্টের হাতে পড়ে তা হলে তাঁর পক্ষে সেটা লাভজনক হবে কি?

নোবেল প্রাইজটা যদি লাভ বলে মনে করেন তা হলে হতে পারে বইকী।

আপনার কি মনে হয় এই কাগজপত্র চুরি করার জন্য চোর আপনার ঘরে ঢুকেছিল?

সেরকম মনে করার কোনও কারণ নেই।

আরেকটা প্রশ্ন। আপনার এই নোটসের কথা আর কে জানে?

বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই এটার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারে। আর জানে আমার বাড়ির লোকেরা আর আমার সেক্রেটারি রণজিৎ।

বাড়ির লোক বলতে কি একতলার দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কথাও বলছেন?

তারা কী জানে না-জানে তা আমি জানি না। এরা ব্যবসাদার লোক। জানলেও কোনও ইন্টারেস্ট হবার কথা না। অবিশ্যি আজকাল তো সব জিনিস নিয়েই ব্যবসা চলে; এ

ধরনের কাগজপত্র নিয়েই বা চলবে না কেন। বিজ্ঞানী হলেই তো আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয় না।

নীহারবাবু উঠে পড়লেন; সেই সঙ্গে আমরাও।

আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি? ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক চৌকাঠের মুখে থেমে গিয়ে বললেন, দেখবেন বইকী। সুবীর দেখিয়ে দেবে। আমি ছাতে সান্ধ্যভ্রমণটা সেরে আসি।

করিডরে বেরিয়ে এলাম চারজনে। অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এসেছে। করিডরের ডাইনে বাঁয়ে ঘরগুলার ভিতুর থেকে মামবাতির ক্ষীণ আলা বাইরে এসে পড়েছে। নীহারবাবু লাঠি ঠক ঠক করে ছাতের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। শুনলাম। তিনি বলছেন, স্টেপ গোনা আছে। সতেরো স্টেপ গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে সিঁড়ি। সেভেন প্লাস এইট–পনেরো ধাপ উঠে ছাত। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন...

৩. নীহারবাবুর ঘর

নীহারবাবুর বেশ বড় ঘরের একপাশে অনেকখানি জুড়ে পুরনো আমলের খাট। খাটের পাশে একটা ছোট গোল টেবিল। তাতে ঢাকনি-চাপা গেলাসে জল, আর তার পাশে রাংতায় মোড়া গোটা দশেক বড়ি। বোধহয় ঘুমের ওষুধ।

এই টেবিলের পাশে জানালার সামনে একটা আরাম কেদারা। তার পিঠে অনেক দিনের ব্যবহারের ফলে বেতের বুনুনিতে কালশিটে পড়ে গেছে। মনে হল এই আরাম কেদারাতেই বেশির ভাগ সময় কাটান নীহারবাবু।

এ ছাড়া আছে একটা কাজের টেবিল—যার উপর এখন একটা মোমবাতি টিমটিম করছে—একটা স্টিলের চেয়ার, টেবিলের উপর লেখার সরঞ্জাম, চিঠির র‍্যাক, একটা পুরনো টাইপরাইটার আর এক তাড়া বৈজ্ঞানিক পত্রিকা।

এই টেবিলের পাশেই, দরজার ঠিক বাঁয়ে, রয়েছে গোদরেজের আলমারিটা।

ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদা তার মিনি টর্চ দিয়ে আলমারির চাবির গর্তটা ভাল করে দেখে বলল, খোলার চেষ্টার অভাব হয়নি। গর্তের চারপাশে দাগ। তারপর এগিয়ে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে বড়ির পাতাটা তুলে নিয়ে বলল, সোনেরিল।...বুঝেছিলাম নীহারবাবু বেশ কড়া ওষুধ খান। না হলে ঘুম ভেঙে যাবার কথা।

তারপর চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ানা চাকর কৌমুদীর দিকে ফিরে বলল, তোমার ঘুম ভাঙল না? তুমি কীরকম পাহারা দাও বাবুকে?

কৌমুদীর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুবীরবাবু বললেন, ও বেজায় ঘুমকাতুরে। এমনিতেই তিনবার না ডাকলে ওঠে না।

বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম আগেই, এবার একটি বছর ত্রিশোকের ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, চোখে চশমা, চুল কোঁকড়া। সুবীরবাবু আলাপ করিয়ে দিতে বুঝলাম ইনিই নীহারবাবুর সেক্রেটারি, নাম রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কে জিতল?

ফেলুদার অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন, করা হয়েছে। সেক্রেটারি মশাইকে। রণজিৎবাবুর ফ্যালফেলে ভাব দেখে ফেলুদা হেসে বলল, আপনার পাতলা টেরিলিনের শার্টের পকেটে স্পষ্ট দেখছি খেলার টিকিটের কাউন্টারফয়েল। তার উপর রোদে মুখ ঝলসানা–লিগের বড় খেলা দেখে এলেন সেটা অনুমান করাটা কি খুব কঠিন?

ইস্টবেঙ্গল, হেসে বললেন রণজিৎবাবু। সুবীরবাবুর মুখেও তারিফ আর বিস্ময় মেশানা হাসে।

আপনি এখানে ক'দিন কাজ করছেন?

চার বছর।

নীহারবাবু তাঁর বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয় কখনও কিছু বলেছেন?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বললেন রণজিৎবাবু, কিন্তু উনি খুলে কিছু বলতে চাননি। তবে চোখ গিয়ে যে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে সেটা উনি মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন।

আর কিছু বলেন?

রণজিৎবাবু একটু ভেবে বললেন, একটা কথা বলতে শুনেছি যে, উনি যে এখনও বেঁচে আছেন তার কারণ হল যে ওঁর একটা কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেটা কী কাজ

আমি জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। মনে হয়। উনি এখনও আশা রাখেন যে ওঁর গবেষণাটা শেষ করবেন।

নিজে তো আর পারবেন না। অন্য কাউকে দিয়ে করবেন। এটাই হয়তো ভেবেছেন। তাই নয় কি?

তাই বোধহয়।

আপনার এখানে ডিউটি কতক্ষণ?

নটায় আসি, ছটায় যাই। আজ খেলা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটি চেয়েছিলাম, উনি আপত্তি করেননি। তবে বাইরে গেলেও সন্ধেবেলা একবার এখানে হয়ে যাই। যদি ওঁর কোনও...

গোদরেজের চাবি কোথায় থাকে? ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল। –টাকা আর গবেষণার নোটস কী অবস্থায় থাকে সেটা একবার দেখে নিতে চাই।

ওই বালিশের নীচে।

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে পাঁচটা চাবি সমেত একটা রিং বার করে আনল। তারপর তা থেকে প্রয়োজনীয় চাবিটা বেছে নিয়ে আলমারি খুলল।

টাকা কোথায় থাকে?

ওই দেরাজে।–রণজিৎবাবু আঙুল দেখালেন।

ফেলুদা দেরাজটা টেনে খুলল।

সে কী!

রণজিৎবাবুর চোখ কপালে। মোমবাতির আলোতেই বুঝলাম তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দেরাজের মধ্যে একটা পাকানো কাগজ—খুলে দেখা গেল সেটা কুষ্ঠী—আর একটা কাশ্মীরি কাঠের বাক্সে কিছু পুরনো চিঠিপত্র। আর কিছু নেই।

এ কী করে হয়?—রণজিৎবাবুর গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরোতে চাইছে না। —তিনটে বান্ডিল করা একশো টাকার নোট...সব মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশ হাজার...

গবেষণার কাগজপত্র কি এই অন্য দেরাজটায়?

রণজিৎবাবু মাথা নাড়লেন। ফেলুদা দ্বিতীয় দেয়াজটা খুলল।

এটা একেবারেই খালি।

বাইরে পায়ের শব্দ—খট খট খট খট। নীহারবাবু ছাত থেকে নামছেন।

মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটির একটা লম্বা সীলমোহর লাগানো খামে ছিল গবেষণার নোটস... রণজিৎবাবুর গলা খটখাটে শুকনো।

আজ সকালে ছিল টাকা আর কাগজপত্র?

আমি নিজে দেখেছি, বললেন সুবীরবাবু।-–একশো টাকার নোটের নম্বরগুলো সব নোট করা আছে। দাদাই এ ব্যাপারে ইনসিস্ট করতেন।

ফেলুদা থমথমে ভাব করে বলল, তার মানে গত মিনিট পনেরোর মধ্যে—অর্থাৎ লোড শেডিং হবার পরেই—ব্যাপারটা ঘটেছে। আমরা যখন বৈঠকখানায় ছিলাম তখন।

নীহারবাবু ঢুকলেন ঘরে। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম তিনি বাইরে থেকে সব শুনেছেন।

আমরা পথ করে দিতে ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে তাঁর আরাম কেদারায় বসলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বোঝো!—গোয়েন্দার নাকের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল।

সামনের সিঁড়ি ছাড়া দোতলায় ওঠার অন্য সিঁড়ি আছে? নীহারবাবুর ঘর থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

সুবীরবাবু বললেন, জমাদারের সিঁড়ি আছে। পিছন দিকে।

লোড শেডিং কি রোজই এই সময় হয়?

তা দিন দশেক হল হচ্ছে। অনেকে তো ঘড়ি মেলাতে শুরু করেছে। ছটায় যায়, আসে দশটায়।

ভাবতে চেষ্টা করলাম ফেলুদার গোয়েন্দা জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা আর ঘটেছে কি না। একটাও মনে পড়ল না।

নীচের বাসিন্দারা কেউ ফিরেছেন কি? সিঁড়ির মুখটায় এসে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

সেটা একবার খোঁজ করা যেতে পারে, বললেন সুবীরবাবু, মোটামুটি এই সময়টাতেই আসে।

নীচের ল্যান্ডিং-এ সিঁড়ির উলটাদিকে মিঃ দস্তুরের ঘরের দরজা। সেটা এখন বন্ধ, আর ঘর। যে অন্ধকার সেটা বাইরে থেকেই বোঝা যায়।

সুখওয়ানির ঘরে যেতে হলে পিছন দিক দিয়ে যেতে হবে, বললেন সুবীরবাবু!

বাড়ির পুব দিক দিয়ে গিয়ে বাগানের পাশের পথ দিয়ে সুখওয়ানির ঘরের দিকে এগোলাম আমরা। ঘরে ফুরোসেন্ট আলো জ্বলছে, ব্যাটারি লাইট, যেমন আজকাল চালু হয়েছে।

পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ফেলুদার টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন, অথচ মানুষগুলো কে বোঝার উপায় নেই। সুবীরবাবু ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন–

একটু আসতে পারি কি?

গলা চিনতে পেরে ভদ্রলোকের চাহনি পালটে গেল।

সার্টিনলি, সার্টনলি!

ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ইউ সি, মিস্টার মিটার—আমার ঘর ভর্তি ভ্যালুয়েবল জিনিস। চুরির কথা শুনলে আমার হৃৎকম্প হয়। আজ সকালে যখন শুনলাম যে রাত্রে চোর এসেছিল, বুঝতেই পারেন তখন আমার কী মনের অবস্থা!

সত্যি, এত দামি জিনিস যে একটা ঘরে থাকতে পারে সে আমার ধারণাই ছিল না। তাণ্ডবমূর্তি, ভৈরবমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাথর, পেতল আর ব্রঞ্জের স্ট্যাচুয়েটের সংখ্যাই অন্তত গোটা তিরিশ। তা ছাড়া ছবি, বই, পুরনো ম্যাপ, নানারকম পত্র, ঢাল-তলোয়ার, পিকদান, গড়গড়া, আতরদান এসব তো আছেই। ফেলুদা পরে বলেছিল, টাকা থাকলে অন্তত বই আর প্রিন্টগুলো সব কিনে ফেলতাম রে তোপ্‌সে!

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে বললেন তিনি নাকি লোডশেডিং-এর দশ মিনিট আগে ফিরেছেন।

এই দশ মিনিটের মধ্যে কেউ এদিকটা এসেছিল কি? দোতলায় যাবার একটা সিঁড়ি রয়েছে। আপনার ঘরের পিছনেই; ওদিক থেকে কোনও আওয়াজ পেয়েছিলেন?

ভদ্রলোক বললেন উনি এসেই স্নানের ঘরে ঢুকেছিলেন।—আর তা ছাড়া এই অন্ধকারে দেখার প্রশ্ন আর উঠছে কী করে? আর ইয়ে, ভাল কথা, আপনারা কি বাইরের লোককে সন্দেহ করছেন?

কেন বলুন তো?

আপনারা মিঃ দস্তুরের সঙ্গে কথা বলেছেন?

ভাবটা যেন, আমরা দস্তুরের সঙ্গে কথা বললেই বুঝে যাব যে তাকে ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা চলতে পারে না।

ফেলুদা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, হি ইজ এ মোস্ট পিকিউলিয়ার ক্যারেকটার। আমি জানি আমার প্রতিবেশী সম্বন্ধে এরকম করে বলা উচিত নয়, কিন্তু আমি ওকে কিছুদিন থেকেই ওয়াচ করছি। গোড়ায় আলাপ হবার আগে শুধু ওর নাকডাকার শব্দ পেতাম ওর জানালা দিয়ে। আমার বিশ্বাস সে শব্দ দোতলা অবধি পৌঁছে যায়।

সুবীরবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে মনে হল সুখওয়ানি খুব বাড়িয়ে বলেনি।

তারপর আলাপ হয়, যখন এক'দিন সকালে ও আমার টাইপরাইটার ধার নিতে আসে। আমার ঘরের জিনিসপত্রের দিকে যেরকম লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছিল সেটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। সাধারণ কৌতুহলবশে জিজ্ঞেস করলাম, ও কী করে। বলল ইলেকট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসা। আরো বাপু, তাই যদি হবে তা হলে এই লোড শেডিং-এর বাজারে ঘরে একটা ব্যাটারি লাইট আর পাখার ব্যবস্থা করনি কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।

ভদ্রলোক থামলেন, আর আমরা সেই ফাঁকে উঠে পড়লাম। ফেলুদা বেরোবার আগে বলল, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মিঃ দত্তকে জানালে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হবে।

পুবের গলিটা দিয়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোনোর সময়ই একটা ট্যাক্সির হর্ন পেয়েছিলাম এবার দেখলাম একটি ভদ্রলোক নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে গাড়িবারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। আবছা আলোতেও দেখতে পাচ্ছি ভদ্রলোক মাঝারি হাইটের এবং মোটা, পরনে খয়েরি টেরিলিনের সুট, পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা মেশানো ফ্রেঞ্চকার্ট দাড়ি। রংটা বোধহয় বেশ ফরসাই। হাতের ব্রিফকেসটা দেখে নতুন বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরতেই সুবীরবাবু তাঁকে গুড ইভনিং জানালেন। তাতে উনি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলাম এ বাড়িতে কারুর মুখ থেকে গুড মর্নিং, গুড ইভনিং শুনতে অভ্যস্ত নন।

গুড ইভনিং, মিঃ ডাট।

অদ্ভুত খ্যানখ্যানে গলার স্বর। কথাটা বলেই চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, ফেলুদা চাপা। ফিসফিসে গলায় সুবীরবাবুকে বললেন, ওকে থামান।

সুবীরবাবু তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলেন।

ইয়ে, মিঃ দস্তুর!

দস্তুর থামলেন। সুবীরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলাম।

সুবীরবাবু সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল? ইওর ব্রাদার মাস্ট বি টেরিবলি আপসেট!

ফেলুদা বলেছিল যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় মানুষের গলার স্বর এত বদলে যেতে পারে যে অনেক সময় চেনাই যায় না। মিঃ দস্তুর ইংরেজিতে আতঙ্ক ও বিস্ময় মেশানো স্বরে এই কথাগুলো বলার সময় লক্ষ করলাম যে খ্যানখ্যানে ভাবটা একেবারেই নেই। প্রায় মনে হয়। যেন আরেকজন মানুষ কথাটা বলল।

আপনি যখন এলেন তখন কাউকে বেরোতে দেখলেন এ বাড়ি থেকে? ফেলুদা প্রশ্ন করল।কই, না তো? বললেন মিঃ দস্তুর। অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে অন্ধকারে দেখতে পাইনি। থ্যাঙ্ক গড় যে আমার ঘরে কোনও মূল্যবান জিনিস নেই!

কে?

প্রশ্নটা এল দোতলার ল্যান্ডিং থেকে। নীহারবাবুর গলা। আমরা সবাই গাড়িবারান্দার সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার ভিতরে ঢুকে উপরে চেয়ে দেখলাম অন্ধকারেও নীহারবাবুর কালো চশমাটা চকচক করছে।

ইটস মি মিস্টার ডাট, দৃষ্টি উপরে করে বললেন দস্তুর-আপনার ভাই এই মাত্র আপনার লস-এর কথাটা বলল। আমি আপনাকে আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি।

চশমাটা সরে গেল। আর তার পরেই মিলিয়ে এল চটি আর লাঠির শব্দ।

আপনারা একটু বসে যাবেন না। আমার ঘরে? বললেন মিঃ দস্তুর। –সারাদিন কাজের পরে একটু সঙ্গ পেলে ভাল লাগে।

ফেলুদা আপত্তি করল না। তার কারণ অবিশ্যি আমি জানি। যে বাড়িতে ক্রাইম ঘটেছে, সে বাড়ির লোকেদের চিনে রাখা গোয়েন্দার গোড়ার কাজ।

সুখওয়ানির ঘরের পর মিঃ দস্তুরের বৈঠকখানার নেড়া ভাবটা সত্যিই দেখবার মতো। আসবাব বলতে একটা সোফা, দুটো কাউচ, একটা রাইটিং ডেস্ক আর একটা বুকশেলফ। সোফার সামনে একটা নিচু টেবিল আছে বটে, তবে সেটা নেহাতই ছোট। তারই উপর একটা মোমবাতি রাখা ছিল। ফেলুদা সেটা ওর লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিল; এখন দেখলাম দেয়ালে একটিমাত্র ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভদ্রলোক ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন বোধহয় চাকরকে ডাকতে; ফিরে আসতে ফেলুদা তাঁকে একটা সিগারেট অফার করল।

নো, থ্যাঙ্কস। ক্যানসারের ভয়ে ধূমপানটা বছর তিনেক হল ছেড়ে দিয়েছি। অন্যের ধূমপানে আশা করি আপত্তি নেই। আপনার অ্যাশট্রেতে অলরেডি একটা আধখাওয়া সিগারেট পড়ে আছে।

ফেলুদা টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল, আমারই ব্র্যান্ড। চারমিনারের টুকরো আমিও দূর থেকেই চিনতে পারি।

দস্তুর বলল, অনেকবার ভেবেছি সুখওয়ানির মতো আমিও আলো-পাখার একটা ব্যবস্থা করে নিই। তারপর যখনই মনে হয়েছে যে কলকাতার শতকরা নব্বই ভাগ লোককে গরম আর অন্ধকার ভোগ করতে হচ্ছে, তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। সেই কারণে আমিও...

আপনার তো ইলেকট্রিক্যাল গুডস-এর ব্যবসা?

ইলেকট্রিক্যাললে?

সুখওয়ানি যে বলছিলেন–

সুখওয়ানি ওই রকমই বলে। ইলেকট্রিক্যাল নয়, ইলেকট্রনিকস। বছরখানেক হল শুরু করেছি।

আপনি নিজেই?

না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে! আমি বোম্বাই-এর লোক, তবে অনেক’দিন দেশের বাইরে। জার্মানিতে একটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মে কাজ করতাম। বন্ধু কলকাতা থেকে লিখলা এখানে চলে আসতে। পয়সা ওর, আমি জোগাচ্ছি অভিজ্ঞতা।

কবে এলেন কলকাতায়?

গত নভেম্বরে। বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম মাস তিনেক; এই ফ্ল্যাটের খবরটা পেয়ে এখানে চলে আসি।

চাকর কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এল। থামস আপ। মিঃ দস্তুর ফেলুদার পরিচয় আগেই পেয়েছেন, এবার গলাটা নামিয়ে বললেন, মিঃ মিটার, আমার ঘরে মূল্যবান জিনিস নেই

ঠিকই, কিন্তু একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। আমার প্রতিবেশীটি কিন্তু খুব সিধে লোক নন। তার ঘরে নানারকম গোপন কারবার চলে। গৰ্হিত ব্যাপার।

আপনি জানলেন। কী করে?

আমার স্নানের ঘর আর ওর স্নানের ঘর লাগোয়া। দুটোর মাঝখানে একটা বন্ধ দরজা আছে। সে দরজায় কান লাগালে মাঝে মাঝে ওর শোবার ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যায়।

ফেলুদা গলা খাকরিয়ে বলল, এই ভাবে কান লাগানোও একটা গৰ্হিত ব্যাপার নয় কি?

মিঃ দস্তর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, সেটা করতাম না! যখন দেখলাম যে আমার চিঠি ভুল করে ওর হাতে পড়লে ও জল দিয়ে খাম খুলে তারপর আবার আঠা দিয়ে সেঁটে ফেরত দেয়, তখন একটা পালটা দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি নির্বাঞ্ঝাট মানুষ। কিন্তু উনি যদি আমার পিছনে লাগেন তা হলে আমিও ওকে ছাড়ব না, এই বলে দিলাম।

কোল্ড ড্রিঙ্কসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

গেটের কাছে এসে ফেলুদা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল। গত আধা ঘণ্টার মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে কি না। সে বলল সুখওয়ানি আর দস্তুরকে ছাড়া কাউকে দেখেনি। এটা আশ্চর্য না। সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের কম্পাউন্ড ওয়াল রয়েছে বাড়ির চারদিক ঘিরে। পিছন দিকের একটা বাড়ি নাকি খালি পড়ে আছে আজ। কয়েক মাস যাবৎ। জোয়ান চোর হলে পাঁচিল টপকে আসায় কোনও অসুবিধা নেই—যদিও আমাদের সকলেরই মন বলছে। এ কাজ বাড়ির লোকেই করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলছে—ভেতরের লোকই যে বাইরের লোককে দিয়ে কাজটা করায়নি তারই বা বিশ্বাস কী?

আমাদের গাড়ি নেই। সুবীরবাবু বলেছিলেন তাঁর গাড়িতে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা, কিন্তু ফেলুদা বলল হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি পেতে কোনও অসুবিধা হবে না।

পুলিশে একটা খবর দিলে ভাল করতেন। কিন্তু।

ফেলুদার এ প্রস্তাবটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সুবীরবাবুও বেশ একটু অবাক হলেন। বললেন, কেন বলছেন বলুন তো!

পুলিশ সম্বন্ধে আপনার দাদার ধারণা। যাই হোক না কেন, পলাতক চোর ধরার যে সব উপায় পুলিশের জানা আছে কোনও প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের তা নেই। বিশেষ করে যখন এতগুলো টাকা, তখন পুলিশকে বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নোটের নম্বর লেখা আছে বলছেন। কাজটা এমনিতেই অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

সুবীরবাবু বললেন, আপনাকে যখন আসতে বলেছি, এবং দুর্ঘটনা যখন একটা ঘটেছে, তখন আপনাকে বাদ দেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। পুলিশ আসুক, কিন্তু তার পাশে আপনিও থাকলে শুধু আমিই নিশ্চিন্ত হব না, দাদাও হবেন! অবিশ্যি, সত্যি বলতে কী, চোর কে সেটা কারুর সাহায্য ছাড়াই আমি বলতে পারি।

আপনার ছেলের কথা বলছেন কি? সুবীরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।–এ শঙ্কর ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সে জানে এ পাড়ায় ছ'টায় বাতি নিভে যায়। ডানপিটে ছেলে, পাঁচিল টপকানো তার কাছে কিছুই নয়। তার পর পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে জ্যাঠার ঘরে ঢুকে আলমারি খোলা–এ সবই তো তার কাছে নাস্যি!

কিন্তু নীহারবাবুর গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে সে কী করবে? বৈজ্ঞানিক মহলে কি তার খুব যাতায়াত আছে?

সেটার দরকার কী বলুন! সে তো সেই কাগজপত্রের বিনিময়ে তার জ্যাঠার কাছ থেকেই টাকা আদায় করতে পারে। এই কাগজপত্রের দাম যে দাদার কাছে কতখানি সেটা তো সে খুব ভালভাবেই জানে!

এই অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম ঘটনা ঘটার ফলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। তার পরেও একই দিনে যে আরও কিছু ঘটতে পারে সেটা ভাবতেই পারিনি। অবিশ্যি সেটার কথা বলার আগে বাড়ি ফিরে এসে ফেলুদা আর আমার মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেটা বলা দরকার।

রাত্রে খাবার পরে ফেলুদার ঘরে গিয়ে দেখি সে খাটে চিত হয়ে শুয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে পান চিবোচ্ছে আর চারমিনার ফুকছে। আমিও গিয়ে খাটে বসলাম। সে প্রশ্নটা গোলোকধাম থেকেই মনে খোঁচা দিচ্ছিল সেটা না বলে পারলাম না।

তুমি কেসটা ছেড়ে দিতে চাইছিলে কেন ফেলুদা?

ফেলুদা পর পর দুটো মোক্ষম রিং ছেড়ে বলল, কারণ আছে রে, কারণ আছে।

কারণ তো বললেই তুমি–পালানো চোর ধরা পুলিশের পক্ষে আরও সহজ– বিশেষ করে যদি অনেক টাকা নিয়ে পালায়।

সুবীরবাবুর ছেলেই নিয়েছে বলে তোর মনে হয়?

আর কে নেবে বল। বাড়ির লোক নিয়েছে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। দস্তুর তো ছিলেনই না। সুখওয়ানি চুরি করে দিব্যি ঘরে বসে থাকবেন সেটাও যেন কেমন কেমন লাগে। রণজিৎবাবুও এলেন চুরির পরে। আর আছে চাকরবাকার...

কিন্তু ধরা যদি মক্কেল নিজেই কিছু করে থাকেন?

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ফেলুদার দিকে।

সুবীরবাবু!

একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চুরি আবিষ্কারের ঠিক আগের ঘটনাগুলো ভেবে দেখা।

আমি চোখ বুজে কল্পনা করলাম আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসে আছি। চা এল। আমরা চা খাচ্ছি। ফেলুদার হাতে কাপ। ঘরের বাতি নিভল। তারপর–

ধাঁ করে একটা জিনিস মনে পড়ে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল।

লোড শেডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে সুবীরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফেলুদা–চাকরকে ডাকতে।

তবে!–ভেবে দেখ আমার পোজিশনটা কী হবে। যদি বেরোয় যে সুবীরবাবুই আলমারি খুলেছিলেন। এটা অসম্ভব নয়। এই কারণেই যে ওই একটি লোক সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। চাকরের কথা যেটা বলেছেন সেটা অবিশ্যি অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ধুর যদি শেয়ার বাজারে বা রেসের মাঠে বা জুয়োর আডডায় ভদ্রলোকের অনেক টাকা খোয়া গিয়ে থাকে, বাজারে একগাদা ধারদেন থাকে, তা হলে তাঁর পক্ষে টাকাটা নেওয়া খুব আশ্চর্য কি?

কিন্তু উনি তো নিজেই এলেন তোমার কাছে! উনিই তো তোমায় গোয়েন্দা অ্যাপয়েন্ট করলেন!

উনি যদি খুব উচ্চস্তরের ধূর্ত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তা হলো নিজের উপর যাতে সন্দেহ না পড়ে তার জন্যে ঠিক ওই কাজটাই করা কিছুই আশ্চর্য নয়।

এর পরে আর কোনও কথা বলা যায় না।

ফেলুদা কালী সিংহের মহাভারতটা হাতে নিয়ে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়েছে দেখে আমি খাট থেকে উঠে পড়লাম।

বসবার ঘরে আসতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ পেলাম। স্কুটার। একটা নয়, একটার বেশি।

নির্জন নিস্তব্ধ পাড়াটাকে কাঁপিয়ে যেন আমাদের বাড়ির সামনেই এসে থামল।

আর তার পরেই আমাদের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

দিনকাল ভাল নয়, আর তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বেটাইমে লোক এলেও স্কুটারে আসে না।

আমি দরজার দিকে না গিয়ে আগে ফেলুদার পর্দাটা ফাঁক করে একবার উঁকি দিলাম। ফেলুদা বই রেখে খাট থেকে উঠে পড়েছে। বলল—দাঁড়া। অর্থাৎ তুই খুলিস না, আমি খুলছি।

দরজা খুলতেই যিনি প্রবেশ করলেন তিনি যে শয়তানের অবতার সেটা বুঝতে পাঁচ সেকেন্ডও লাগল না। বসবারও দরকার নেই, ঘরে ঢুকে পিঠ দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ফেলুদার দিকে ঘোলাটে চোখ করে তাকিয়ে কথার চাবুক আছড়াতে শুরু করলেন সুবীর দত্তর ছেলে শঙ্কর দত্ত।

শুনুন মশাই, আমার বাবা আমার বিষয়ে কী বলেছেন জানি না, কিন্তু গেস করতে পারি। এইটুকু শুধু বলে দিচ্ছি। আপনাকে—আমার পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে কারুর বাপের সাধ্যি নেই কিছু করে। আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি; আমি এক নই। আমাদের গ্যাং আছে। বেশি ওস্তাদি করলে পস্তাবেন। বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব এই বলে দিলাম।

শঙ্কর দত্ত যেরকম নাটকীয় ভাবে ঢুকেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন স্পিচ ঝাড়া শেষ করে। তারপরই আওয়াজ পেলাম তিনটে স্কুটার স্টার্ট নিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ফেলুদা এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল। স্নায়ুর উপর অসাধারণ দখল আছে বলেই এত অপমানেও ও পাথর। ও বলে প্রচণ্ড রাগে যে ফেটে পড়ে তার চেয়ে সেই রাগ যে দমিয়ে রাখতে পারে তার মনের জোর বেশি।

স্কুটারের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই কিন্তু ফেলুদা ঝড়ের বেগে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে পকেটে তার মানিব্যাগটা নিয়ে নিয়েছে।

চ' তোপ্‌সে–ট্যাক্সি...

তিন মিনিটের মধ্যে সাদান এভিনিউতে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লাম দুজনে। উত্তর দিকে গেছে স্কুটারগুলো এটা জানি।

ল্যানসডাউন ধরুন, বলল ফেলুদা। বড় রাস্তায় খোঁড়াখুড়ি, তাই ল্যানসডাউন রোড ধরেই যাবে ওরা এটা আমারও মনে হয়েছিল।

পৌনে এগারোটা। সার্দান এভিনিউ প্রায় ফাঁকা। ট্যাক্সি চালক বাঙালি, আমাদের মুখ চেনা। বললেন, কাউকে ফলো করবেন, স্যার?

তিনটে স্কুটার, চাপা গলায় বলল ফেলুদা।

আন্দাজে ভুল নেই। এলগিন রোডের মাড়ের কাছে এসে স্কুটার তিনটের দেখা পাওয়া গেল। শঙ্কর একই বসেছে একটায়, অন্য দুটোয় দুজন করে লোক। এরা সব মাকামারা মস্তান সেটা আর বলে দিতে হয় না। আমাদের ট্যাক্সি ওদের লেজ ধরে চলতে লাগল।

লোয়ার সাকুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট পেরিয়ে স্কুটারগুলো পার্ক স্ট্রিটে পড়ে বা দিকে ঘুরল। একেবেঁকে সাপের মতো চালানোয় বোঝা যাচ্ছে এদের বেপরোয়া ফুর্তির ভাবটা। ফেলুদা রাস্তার আলো বাঁচিয়ে ভিতর দিকে চেপে বসেছে, তার মাথায় কী খেলছে। কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিরজা গালিব স্ট্রিট দিয়ে কিছুদূর গিয়ে স্কুটারগুলো আবার বাঁয়ে ঘুরল। মাকুইস স্ট্রিট। রাস্তা সরু হয়ে আসছে, পাড়া অন্ধকার, বাতিগুলো টিমটিমে। যাতে ওরা সন্দেহ না করে তাই ফেলুদার আদেশে আমাদের ড্রাইভার ট্যাক্সির স্পিড কমিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা একটু বাড়িয়ে নিল।

আরও দুটো মোড় ঘুরে দেখলাম স্কুটারগুলো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে।

“চালিয়ে বেরিয়ে যান, বলল ফেলুদা।

বাড়ি না। এক ধরনের হোটেল। নাম নিউ কোরিনথিয়ান লাজ। নিউ ? বাড়ির বয়স কম করে একশো বছর।

ফেলুদার কাজ শেষ। বুঝলাম। এদের ডেরাটা জানার দরকার ছিল।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন এগারোটা চল্লিশ। ভাড়া উঠেছে উনিশ পঁচাত্তর।

পরদিন ভোরে সিধুজ্যাঠার আবির্ভাবটা একেবারে আনএক্সপেকটেড। উনি সকালে হাঁটতে বেরোন জানি, কিন্তু সেটা লেকের দিকে। আমাদের বাড়িতে আসার মানেই কোনও একটা বিশেষ কারণ আছে।

খাতার ওজন অনেক, তাই খবরটা কপি করে এনেছি, বললেন সিধুজ্যাঠা।– সুপ্রকাশ কিনা জানি না, তবে এস. চৌধুরী বলে লিখেছে, আর বায়োকেমিস্ট সেটাও লিখেছে।

কবেকার খবর?

উনিশশো একাত্তর। মেক্সিকোতে একটা ড্রাগ কোম্পানির উপর পুলিশের হামলায় একটি বাঙালি বায়োকেমিস্ট ধরা পড়ে, নাম এস.চৌধুরী। ভেজাল ড্রাগের ব্যবসা চালাচ্ছিল; তার ফলে সব মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। লোকটার জেল হয়। এইটুকুই খবর।

আসলে মাথায় ঘুরছে। সুপ্রকাশ, তাই এস. চৌধুরীর সঙ্গে নামটা ঠিক কানেক্ট করতে পারিনি। অবিশ্যি এ সেই একই এস. চৌধুরী কি না—

একই গভীর ভাবে বলল ফেলুদা।

সিধুজ্যাঠা উঠে পড়লেন। তাঁর আজ চুল কাটার দিন, নাপিত এসে বসে থাকবে। ফেলুদার পিঠ চাপড়ে, আমার কান ধরে একটা মোচড় দিয়ে, মালকোচাটা একটু ভাল করে গুজে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ফেলুদা খাতা খুলে হিজিবিজি লেখা শুরু করেছে দেখে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর পর তিনটে প্রশ্ন লেখা রয়েছে খাতায়—

১) চাবির গর্তের ধারে আচড়ের বাড়াবাড়ি কেন?

২) কে-র অর্থ কী?

৩) অসমাপ্ত কাজটা কী?

প্রশ্নগুলো পড়ে সে সম্বন্ধে আমিও খানিকটা না ভেবে পারলাম না।

এটায় খটকা লাগার একটা কারণ থাকতে পারে। রীতিমতো জোরে ঘষা না লাগলে ইস্পাতের ওপর ওরকম দাগ পড়তে পারে না। নীহারবাবুর ঘুম কি এতই গভীর যে এত ঘষাঘষিতেও ঘুম ভাঙবে না ?

কে-র ব্যাপারট্রা প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর মনে পড়ল যে মিঃ দস্তুরের গলা শুনে দোতলার ল্যান্ডিং থেকে নীহারবাবু কে বলে উঠেছিলেন। ফেলুদা এই কে প্রশ্নে খটকার কারণ কী দেখল সেটা বুঝলাম না।

অসমাপ্ত কাজের কথাটাও নীহারবাবুই বলেছেন। অন্তত রণজিৎবাবু তাই বলেন। সেটা যে উনি গবেষণার বিষয় বলছিলেন সেটা কি ফেলুদা বিশ্বাস করে না?

ফেলুদা আরও কী সব লিখতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। ওর ঘরেই এক্সটেনশন ফোন; বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিল।

হ্যালো।

দু-চারবার হুঁ হুঁ করে এবং শেষে আমি এক্ষুনি আসছি বলে ফোনটা রেখে ফেলুদা আলনা থেকে শার্ট ও ট্রাউজার সমেত হ্যাঁঙ্গারটা একটানে নামিয়ে নিয়ে বলল, তৈরি হয়ে নে। গোলোকধামে খুন।

আমার বুক ধড়াস।

কে খুন হল?

মিঃ দস্তুর।

বড় রাস্তা থেকে বালিগঞ্জ পার্কে ঢুকতেই দূরে সাতের একের সামনে দেখলাম পুলিশের ভ্যান আর লোকের জটিল। তাও সাহেবি পাড়া বলে রক্ষে, নইলে ভিড় আরও অনেক বেশি হত।

কলকাতার পুলিশ মহলে ফেলুদাকে চেনে না। এমন লোক নেই। গোলোকধামে ঢুকতেই ওকে দেখে ইন্সপেক্টর বকশী হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললেন, এসে পড়েছেন? গন্ধে গন্ধে হাজির?

ফেলুদা ওর একপেশে হাসিটা হেসে বলল, সুবীরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি; ফোন করছিলেন, তাই চলে এলাম। আপনাদের কাজে কোনও ব্যাঘাত করব না। গ্যারান্টি দিচ্ছি। খুনটা হল কী ভাবে?

মাথায় বাড়ি। একটা নয়, তিনটে। ঘুমন্ত অবস্থায়! লাশ নিয়ে যাবে এইবার পোস্টমর্টেমের জন্য। ডাঃ সরকার একবার এসে দেখে গেছেন। আন্দাজ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে।

লোকটার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন?

খুব গণ্ডগোল। সুটকেস গুছাতে শুরু করেছিল। সটকাবার তালে ছিল।

টাকাকড়ি গেছে কিছু?

মনে তো হয় না। খাটের পাশের টেবিলে ওয়ালেটে শতিনেক টাকা রয়েছে। বাড়িতে ক্যাশ বেশি রাখত বলে মনে হয় না। অথচ ব্যাঙ্কের জমার খাতা, চেক বই এসব কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। একটা সোনার ঘড়ি পাওয়া গেছে বালিশের পাশে। এখনও ভাল করে। সার্চ করা হয়নি; এবার করবে। এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা থেকে লোকটার সঠিক পরিচয় কিছু পাওয়া যায়নি।

সুবীরবাবু মিনিট খানেক হল এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। মিঃ বকশীকে উদ্দেশ করে বললেন, সুখওয়ানি বেজায় তম্বি করছে। বলছে তার নাকি একটা জরুরি অ্যাপিয়েন্টমেন্ট আছে ডলহাউসিতে। আমি বলেছি জেরা না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া যাবে না।

ঠিকই বলেছেন, বললেন মিঃ বকশী।অবিশ্যি জেরাতে আপনিও বাদ যাবেন না।

শেষের কথাটা হালকা হেসে বললেন মিঃ বকশী। সুবীরবাবু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সেটা তিনি জানেন।

তবে আমার দাদাকে যত অল্পের উপর দিয়ে সারিতে পারেন ততই ভাল।

ন্যাচারেলি।

ঘরটা একবার দেখতে পারি কি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই!

বকশী ও ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, পিছনে আমি। ঘরে ঢোকার আগে ফেলুদা সুবীরবাবুর দিকে ফিরে বলল, ভাল কথা, আপনার ছেলে কাল আমার বাড়িতে এসেছিল।

কখন!–সুবীরবাবু অবাক।

ফেলুদা সংক্ষেপে কাল রাত্তিরের ঘটনাটা বলে বলল, সে কি কাল ফিরেছিল?

ফিরে থাকলেও টের পাইনি), বললেন সুবীরবাবু। সকালে উঠে তাকে দেখিনি।

যাক, তা হলে আপনার ছেলের ডেরার একটা সন্ধান পাওয়া গেল, বললেন মিঃ বকশী, ওই হোটেলটা মোটেই সুবিধের নয়। বার দুয়েক রেড হয়ে গেছে ওখানে অলরেডি।

কালকের দেখা ঘরের চেহারা আজ একেবারে পালটে গেছে! কাল ছিল অন্ধকার, আর আজ দুটো জানালা দিয়ে ঝলমল রোদ এসে, সোফা আর মেঝের উপর পড়েছে। আশ্চর্য লাগল দেখে যে কালকের দেখা চারমিনারের টুকরোটা এখনও অ্যাশট্রেতে পড়ে আছে। ঘরে দুজন পুলিশের লোক রুয়েছে, আর পুলিশের ফোটাগ্রাফার তাঁর কাজ শেষ করে সরঞ্জাম ব্যাগে পুরছেন।

খুনটা অবিশ্যি হয়েছে পাশের শোবার ঘরে। ফেলুদা বকশীর সঙ্গে সেই ঘরেই গিয়ে ঢুকল। আমি চৌকাঠ অবধি গিয়ে একবার বিছানার দিকে চেয়ে চাদরে ঢাকা লাশটা দেখে নিলাম। একজন পুলিশের লোক খানাতল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে একটা খোলা সুটকেসের মধ্যে দেখলাম কিছু জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখা রয়েছে। তার পাশে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে গতকাল দস্তুরের হাতে দেখা নতুন ব্রিফকেসটা।

আমি আরও মিনিট তিনেক বসবার ঘরে জিনিসপত্র দেখে কাটিয়ে দিলাম। কোনও কিছুতেই হাত দেওয়া চলবে না। এটা জানি, তার উপর দুটো পুলিশই আমার দিকে ড্যাকড্যাবি করে চেয়ে আছে।

চ' তোপ্‌সে।

ফেলুদা বেরিয়ে এসেছে শোবার ঘর থেকে। আপনি আছেন কিছুক্ষণ? বকশী প্রশ্ন করল।

একবার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাব, বলল ফেলুদা। ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে বলবেন।

সুধীরবাবু দোতলায় অপেক্ষা করেছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক তাঁর আরাম কেদারায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখে কালো চশমা, হাতের লাঠি পাশে খাটের উপর শোয়ানো। অ্যাদ্দিন লাঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দেখেছি, তাই সেটার মাথা যে রুপো দিয়ে বাঁধানো সেটা বুঝতে পারিনি। মাথার নকশার মধ্যে খোদাই করা জি বি ডি দেখে বুঝলাম লাঠিটা ছিল নীহারবাবুর ঠাকুরদা গোলোকবিহারী দত্তর।

আমরা এসেছি সে খবরটা দেওয়াতে নীহারবাবু কান্ত করা ঘাড়টাকে একটু সোজা করে বললেন, শব্দ পেয়েছি। পায়ের শব্দ। শব্দ আর স্পর্শ-এই দুই নিয়েই তো কাটিয়ে দিলাম বিশ বছর। আর স্মৃতি...কী হতে পারত, কী হল না। লোকে বলে দুর্ভাগ্য। আমি তো জানি এটা ভাগ্য-টাগ্য কিছু নয়। আপনি সেদিন জিজ্ঞেস করলেন বিস্ফোরণটা অসাবধানতার জন্য হয়েছিল কিনা: আজ। আপনাকে বলছি মিঃ মিত্তির-সমস্ত ব্যাপারটা করা হয়েছিল আমার শ্রম পণ্ড করার জন্য। ঈর্ষা যে মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে সেটা আপনি গোয়েন্দা হয়ে নিশ্চয়ই বোঝেন।

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা বলল, তার মানে আপনার ধারণা সুপ্রকাশ চৌধুরীই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী?

বাঙালি যে বাঙালির সবচেয়ে বড় শত্রু সেটা আপনি মানেন কি?

ফেলুদা একদৃষ্টি চেয়ে আছে কালো চশমার দিকে। নীহারবাবুও যেন উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

ফেলুদা বলল, আপনি এখন যে কথাটা যে ভাবে আমাদের বলছেন, সেটা এর আগে কাউকে বলেছেন কি?

না, বলিনি। কোনওদিন না। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পর আমার এই কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু বলিনি। বলে কী করব? আমার সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। যে এটার জন্য দায়ী, তার শাস্তি হলে তো আর আমি দৃষ্টি ফিরে পাব না, বা আমার গবেষণাও শেষ করতে পারব না।

কিন্তু আপনাকে চিরকালের মতো অসহায় করে চৌধুরীরই বা কী লাভ হল বলুন। সে কি ভেবেছিল যে আপনার কাগজপত্রগুলো হাত করে সে-ই গবেষণা চালিয়ে নিজে নাম কিনবে?

নিশ্চয়ই তাই। তবে তার সে ধারণা ভুল। আমি তো বলেইছি আপনাকে। আমাকে ছাড়া এগোনোর পথ ছিল না তার।

আমরা দুজনেই খাটে বসেছি। ফেলুদাকে দেখে বুঝতে পারছি সে গভীর ভাবে চিন্তা করছে। রণজিৎবাবু ইতিমধ্যে ঘরে এসে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সুবীরবাবু কোনও কাজে বাইরে গেছেন।

ফেলুদা বলল, টাকার কথা জানি না, সেটা হয়তো পুলিশের পক্ষে উদ্ধার করা আরও সহজ, কিন্তু আপনার এত মূল্যবান কাগজপত্র আমি এ বাড়িতে উপস্থিত থাকতে চুরি হয়ে গেল, এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। ওগুলো উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা আমি চালিয়ে যাব।

আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

আমরা আর বেশিক্ষণ থাকলাম না। পুলিশ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বকশী ফেলুদাকে বলে দিলেন যে তাদের জেরা আর খানাতল্লাশির কী ফল হয় সেটা ফোনে জানিয়ে দেবেন।

আর নিউ কোরিনথিয়ান লজের খবরটাও জানাতে ভুলবেন না, বলে দিল ফেলুদা।

আমরা বাড়ি ফিরেছি। সাড়ে দশটায়। তখন থেকে শুরু করে দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত ফেলুদা পায়চারি করে, থেমে, শুয়ে-বসে, চোখ খুলে, চোখ বুজে, ভ্রকুটি করে, মাথা নেড়ে, বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে ছোট বড় মাঝারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তার মনের মধ্যে নানারকম প্রশ্ন সন্দেহ খটকা দ্বন্দ্ব ইত্যাদির হুটোপটি চলছিল। একবার হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, গোলকধামের একতলার প্ল্যানটা তোর মোটামুটি মনে পড়ছে?

আমি একটু ভেবে বললাম, মোটামুটি।

সুখওয়ানির ঘর থেকে দস্তুরের ঘরে কীভাবে যাওয়া যায় বল তো?

আমি আবার একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, যদ্দূর মনে পড়ছে, দুটো ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যে বরাদ্দাটা গেছে, তার মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, আর সে দরজাটা বোধ হয় বন্ধ থাকে। সেটা খোলা থাকলে সেই বারান্দা দিয়েই সোজা এক ফ্ল্যাট থেকে আরেক ফ্ল্যাটে চলে যাওয়া যেত।

ঠিক বলেছিস। তার মানে সুখওয়ানিকে যদি দস্তুরের ফ্ল্যাটে আসতে হয় তা হলে বাগান ঘুরে বাড়ি আর কম্পাউন্ড-ওয়ালের মধ্যের গলি দিয়ে একেবারে সামনে এসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়।

কিন্তু সামনের কেল্যাপসিবল গেট কি মাঝরাত্তিরে খোলা থাকবে?

নিশ্চয়ই না?

তারপর আবার পায়চারি শুরু করে বলতে লাগল–

X, Y, Z...X, Y, Z...X হল গবেষণার কাগজ, Y হল টাকা, আর Z হল খুন। এখন কথা হচ্ছে– X, Y, Z, কি একই সূত্রে গাঁথা, না তিনটে আলাদা…

আমি এক ফাঁকে বলে ফেললাম, ফেলুদা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে সুপ্রকাশ চৌধুরী দস্তুর সেজে নীহারবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে যে ফেলুদা মোটেই আমার কথাটা উড়িয়ে দিল না। বরং আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলল, যদিও এ ধারণাটা আমার মাথায় আগেই এসেছে, তবুও বলতেই হয়। আজকাল তোর চিন্তায় মাঝে মাঝে বেশ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু দস্তুর যদি সুপ্রকাশ হয়, তা হলে মনে করা যেতে পারে সে গবেষণার নেটসের লোভেই ওখানে আস্তানা নিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই যদি খামটা চুরি করে থাকে তা হলে সেটা গেল কোথায়? আর তার পক্ষে নিজে চুরি করাটা সম্ভবই বা হয় কী করে? সে তো দোতলায় কোনওদিন যায়ইনি।

আমার সত্যিই মাথা খুলে গেছে। ব্যাপারটা তো জলের মতো সোজা! বললাম, উনি যাবেন। কেন? ধরা যদি ওঁর সঙ্গে শঙ্কর দত্তর ষড় হয়ে থাকে? শঙ্করই কাগজটা চুরি করে ওকে এনে দিয়েছে, আর তার জন্য কিছু টাকাও পেয়ে গেছে।

এক্সেলেন্ট বলল ফেলুদা।অ্যাদিনে বলা যায় তুই আমার উপযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট হলি। কিন্তু এতে তো খুনের রহস্যের সমাধান হচ্ছে না।

ধরে যদি রণজিৎবাবু বুঝে থাকেন যে দস্তুর আসলে সুপ্রকাশ। রণজিৎবাবু তো নীহারবাবুর সব ব্যাপারই জানেন, আর সেই সঙ্গে নীহারবাবুকে দারুণ ভক্তিও করেন। যে লোক নীহারবাবুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছিল, তার উপর প্রচণ্ড আক্রোশে খুন করতে পারেন না রণজিৎবাবু?

ফেলুদা মাথা নাড়ল।

খুন জিনিসটা অত সহজ নয় রে তোপ্‌সে। রণজিতের মোটিভটাকে মোটেই জোরালো বলা চলে না। আসল আপশোঁসের ব্যাপার হচ্ছে যে দস্তুর লোকটার ঘরে সার্চ করে এখন অবধি কিছু পাওয়া গেল না। অত্যন্ত সাবধানী লোক ছিলেন এই দস্তুর।

আমার কী মনে হয় জান ফেলুদা?

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে আমার দিএক চাইল। আমি বললাম, 'পুলিশের বদলে তুমি যদি সার্চ করতে তা হলে অনেক রকম ক্লু পেতে।

বলছিস?

ফেলুদা নিজের ওপর কনফিডেন্স হারাচ্ছে এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না; কিন্তু ওর ওই বলছিস কথাটাতে যেন ওটারই একটা আভাস পেলাম। আর তারপর যে কথাটা বলল তাতে মনটা আরও দমে গেল।

এই গরম আর এই লোড শেডিং-এ আইনস্টাইনেরও মাথা খুলত কিনা সন্দেহ।

দুটো নাগাদ ইন্সপেক্টর বকশীর ফোন এল। দস্তুরের একটা জুতোর গোড়ালির মধ্যে একটা চোরা খুপরিতে অ্যামেরিকান ডলার আর জার্মান মার্ক মিলে প্রায় সতেরো হাজার টাকা পাওয়া গেছে। কিন্তু এমন কোনও কাগজ বা দলিল পাওয়া যায়নি যা থেকে লোকটার বিষয় কিছু জানা যায়। ইলেকট্রনিকস-এর নতুন কোনও দোকানের হদিস মেলেনি, দস্তুরের কোনও বন্ধুরাও সন্ধান পাওয়া যায়নি। চিঠিপত্র প্রায় ছিল না বললেই

চলে। একটি মাত্র ব্যক্তিগত চিঠি, আর্জেন্টিনা থেকে লেখা, যা থেকে বোঝা যায় যে সে দক্ষিণ আমেরিকায় কিছুদিন কাটিয়েছিল।

বকশীর দ্বিতীয় খবর হচ্ছে এই যে, নিউ কোরিনথিয়ান লজের ম্যানেজারকে ছবি দেখাতে সে শঙ্করকে চিনেছে; কাল সারারাত নাকি শঙ্কর কয়েকজন বন্ধু সমেত হোটেলের একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে নেশা করেছে আর জুয়া খেলেছে। সকাল হতে তারা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। বকশী বললেন এবার শঙ্করকে ধরা নাকি এ ম্যাটার অফ মিনিটস।

ফেলুদা সব শুনেটুনে ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, শঙ্করবাবু যদি হোটেলের পেমেন্টটা চুরির টাকায় করতেন তা হলে খুব সুবিধে হত। যাই হাক, এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে খুনটা সে করেনি, কারণ সেই সময়টা তার অ্যালিবাই ছিল।

অ্যালিবাই কথাটার মানে অবিশ্যি আমি অনেকদিন থেকেই জানি, কিন্তু যারা জানে না তাদের বাংলায় কীভাবে বোঝানো যায় জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল, ডিকশনারিতে যা লেখা আছে তাই লিখে দে। তাই বলছি, অ্যালিবাই মানে হল—অপরাধের অনুষ্ঠানকালে অন্যত্র থাকার অজুহাতে রেহাই পাইবার দাবি। তার মানে আমার বাড়িতে যখন খুন হয় তখন আমি কোরিনথিয়ান লজে বসে জুয়া খেলছিলাম—এটাই হবে শঙ্করের অ্যালিবাই।

টেলিফোনটা পেয়েও ফেলুদার উসখুস ভাব গেল না। তিনটে নাগাদ দেখি ও পায়জামা ছেড়ে ট্রাউজারস পরেছে। বলল কতগুলো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাই বেরোচ্ছে। ফিরল প্রায় সাড়ে চারটেয়। আমি এই দেড় ঘণ্টা একটানা মহাভারত পড়ে শেষ করে ফেলেছি।

মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী নকুল সহদেব সবাই একে একে মরে গিয়ে ঠিক যখন অর্জ্জুনের পতন হব-হব, তখন ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ফেলুদার ফোন, গোলোকধাম থেকে সুবীরবাবু কথা বলতে চাইছেন।

ফেলুদা তার ঘরেই ফোন ধরল; আমি বসবার ঘরের ফোনে কান লাগিয়ে দু। তরফের কথাই শুনে নিলাম।

হ্যালো।

কে, মিঃ মিত্তির?

বলুন মিঃ দত্ত।

দাদার গবেষণার নোটস সমেত সীল করা খামটা পাওয়া গেছে।

দস্তুরের ঘরে ছিল কি?

ঠিক বলেছেন। খাটের পাটাতনের তলায় সেলেটেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল। একদিকের সেলেটেপ খুলে গিয়ে ঝুলছিল। পেয়েছে আমাদের চাকর ভগীরথী।

আপনার দাদা জানেন খবরটা?

তা জানেন। তবে দাদার মধ্যে কেমন যেন একটা হাল-ছেড়ে–দেওয়া ভাব এসেছে। কোনও ব্যাপারেই যেন বিশেষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আজ সারাদিন চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি। আমি আমাদের ডাক্তারকে আসতে বলেছি।

আপনার ছেলের কোনও খবর আছে?

আছে। জি টি রোডে ওদের পুরো দলটাই ধরা পড়েছে।

আর চোরাই টাকা?

সেটা নিলেও অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে। অবিশ্যি চুরির ব্যাপারটা শঙ্কর সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে।

খুনের ব্যাপারে পুলিশ কী বলছে?

ওরা সুখওয়ানিকেই সন্দেহ করছে। তা ছাড়া একটা নতুন ক্লু-ও পাওয়া গেছে। দস্তুরের জানলার বাইরে পড়ে থাকা একটা দলা পাকানো কাগজ।

কী লেখা আছে তাতে?

ইংরেজিতে এক লাইন হুমকি—অতিরিক্ত কৌতুহলের পরিণাম কী জান তো?

সুখওয়ানি কী বলে?

সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। তার ঘর থেকে যে দস্তুরের ঘরে যাবার কোনও উপায় নেই সেটা ঠিকই, কিন্তু একটা ভাড়াটে গুণ্ডা পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে অনায়াসেই সে কাজটা করতে পারে।

হুঁ...ঠিক আছে, আমি একবার আসছি।

ফেলুদা ফোনটা রেখে দিয়ে প্রথমে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, x আর Y তা হলে একই লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে z-কে নিয়ে। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ডেসটিনেশন গোলোকধাম। তৈরি হয়ে নে তোপ্সে।

৪. শব্দভেদী বাণ

আপনি চললেন নাকি?

গোলোকধামের গেট দিয়ে ঢুকে দেখি রণজিৎবাবু আসছেন। বাইরে পুলিশ দেখে বুঝেছি বাড়িটার উপর নজর রাখা হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বললেন রণজিৎবাবু, নীহারবাবু বললেন আজ আর আমাকে প্রয়োজন হবে না।

উনি আছেন কেমন?

ডাক্তার এসেছিলেন। বললেন বাড়িতে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটাতে শক পেয়েছেন। প্রেসারটা ওঠানামা করছে।

কথা বলছেন কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বলছেন, আশ্বাসের সুরে বললেন রণজিৎবাবু।

যে খামটা পাওয়া গেছে দস্তুরের ঘর থেকে সেটা একবার দেখব। আপনার খুব তাড়া না। থাকলে আর একবারটি চলুন ওপরে। আলমারিতে আছে তো। ওটা?

হ্যাঁ।

আপনাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না কথা দিচ্ছি। এ বাড়িতে তো আর বিশেষ অ্যাস-টাসা হবে।

কিন্তু খাম তো সীল করা, কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন রণজিৎবাবু।

তা হলেও আমি জিনিসটা একবার শুধু হাতে নিয়ে দেখতে চাই।

রণজিৎবাবু আর আপত্তি করলেন না।

আজও বাড়ি অন্ধকার, দশটার আগে আলো আসবে না, এখন বেজেছে মাত্র সোয়া-ছটা। দোতলার বারান্দায় আর ল্যান্ডিং-এ কেরোসিন ল্যাম্প জ্বললেও আনাচে-কানাচে অন্ধকার।

রণজিৎবাবু আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে সুবীরবাবুকে খবর দিতে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যে নীহারবাবু যদি খামটা আলমারি থেকে বার করার ব্যাপারে আপত্তি করেন, তা হলে কিন্তু সেটা দেখানো সম্ভব হবে না।

সেটা বলাই বাহুল্য, বলল ফেলুদা।

সুবীরবাবুকে দেখে বেশ ক্লান্ত বলে মনে হল। বললেন। সারাদিন নাকি খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ঠেকিয়ে রাখতেই কেটে গেছে। তবে একটা ভাল। এই যে, দাদার নামটা লোক ভুলতে বসেছিল, এই সুবাদে আবার মনে পড়ছে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই রণজিৎবাবু এলেন, হাতে লম্বা সাদা খাম। বললেন, নীহারবাবু আপনার নাম শুনেই বোধহয় আপত্তি করলেন না। এমনিতে কাউকে দেখতে দিতেন না।

আশ্চর্য, ফেলুদা খামটা হাতে নিয়ে ল্যাম্পের তলায় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে মন্তব্য করল। আমার চোখে মনে হচ্ছে সাধারণ লম্বা খাম, পিছনে লাল গালার সীল, সামনের দিকে ওপরের বা কোণে ছাপার হরফে লেখা ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান, মিশিগ্যান, ইউ এস এ। এতে যে আশ্চর্যের কী আছে জানি না। সুবীরবাবু আর রণজিৎবাবু বসে আছেন আবছা অন্ধকারে, তাঁদেরও মনের অবস্থা নিশ্চয়ই আমার মতো।

ফেলুদা সোফায় এসে বসল, তার দৃষ্টি তখনও খামটার দিকে। তারপর দুই ভদ্রলোককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, শুধু আমাকেই উদ্দেশ করে কথা বলতে শুরু করল। ভাবটা স্কুলমাস্টারের। এই মেজাজে অনেক সময় অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান দিয়েছে ফেলুদা আমাকে!

বুঝেছিস তোপ্‌সে, আশ্চর্য জিনিস এই ইংরেজি হরফ। বাংলায় সব মিলিয়ে গোটা দশ বারো ধাঁচের হরফ আছে, আর ইংরিজিতে আছে কম পক্ষে হাজার দুয়েক। একটা তদন্তের ব্যাপারে আমাকে এই নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করতে হয়েছিল। হরফের শ্রেণী আছে, জাত আছে, প্রতিটি শ্রেণীর আলাদা নাম আছে। যেমন এই বিশেষ ডিজাইনের হরফের নাম হল গ্যারামণ্ড।-ফেলুদা খামের উপর ছাপা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের দিকে আঙুল দেখাল। তারপর বলে চলল—

এই গ্যারামন্ড টাইপের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে, ফ্রান্সে। তারপর ক্রমে এই টাইপ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড, জার্মানি, সুইটজারল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে শুধু যে এই টাইপের প্রচলন হয় তা নয়, ক্রমে এই সব দেশের নিজস্ব কারখানায় এই টাইপের ছাঁচ তৈরি করা শুরু করা হয়। এমনকী সম্প্রতি ভারতবর্ষেও এটা হচ্ছে। মজা এই যে, খুব ভাল করে দেখলে দেখা যায় যে এক দেশের গ্যারামন্ডের সঙ্গে অন্য দেশের গ্যারামন্ডের সূক্ষ্ম তফাত রয়েছে। কয়েকটা বিশেষ বিশেষ অক্ষরের গড়নে এই তফাতটা ধরা পড়ে। যেমন এই খামের উপরের হরফট হওয়া উচিত আমেরিকান গ্যারামণ্ড, কিন্তু তা না হয়ে এটা হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ান গ্যারামন্ড। এমনকী ক্যালকাটা গ্যারামণ্ডও বলতে পারিস।

ঘরে থমথমে স্তব্ধতা। ফেলুদার দৃষ্টি খাম থেকে চলে গেছে রণজিৎবাবুর দিকে। লন্ডনে মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়ামে মোমের তৈরি বিখ্যাত লোকের মূর্তির ছবি দেখেছি, তার সব কিছু অবিকল মানুষের মতো হলেও, শুধু কাচের চোখগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটা জ্যান্ত নয়। রণজিৎবাবু জ্যান্ত হলেও, তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটো দেখাচ্ছে অনেকটা সেই মোমের মূর্ত্তির চোখের মতো।

কিছু মনে করবেন না রণজিৎবাবু, আমি এই খামটা খুলতে বাধ্য হচ্ছি।

রণজিৎবাবু তাঁর ডান হাতটা তুলে একটা বাধা দেওয়ার ভঙ্গির মাঝপথে থেমে গেলেন।

একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে ফেলুদার দু আঙুলের এক টানে খামের পাশটা ছিঁড়ে গেল। তারপর সেই দু আঙুলেরই আরেকটা টানে খামের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ।

রুল টানা ফুলস্ক্যাপ।

তাতে শুধু রুলই আছে, লেখা নেই। অর্থাৎ যাকে বলে ব্ল্যাঙ্ক পেপার।

কাচের চোখ এখন বন্ধ, মাথা হেঁট, দুহাতের কনুই হাঁটুর উপর, হাতের তেলোয় মুখ ঢাকা।

রণজিৎবাবু, ফেলুদার গলা গম্ভীর–আপনি গতকাল সকালে এসে যে চোর আসার ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা একেবারে ধাপ্পা, তাই না?

রণজিৎবাবুর মুখ দিয়ে উত্তরের বদলে বেরোল শুধু একটা গোঙানির শব্দ। ফেলুদা বলে চলল–

আসলে রাত্তিরে চোর এসেছে এমন একটা ধারণা প্রচার করার দরকার ছিল আপনার। কারণ আপনি নিজেই চুরির জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, এবং সন্দেহটা যাতে আপনার উপর না পড়ে সেদিকটা দেখা দরকার ছিল। আমার বিশ্বাস সকালে চোর আসার ধাপ্পাটা দিয়ে দুপুরের দিকে সুযোগ বুঝে আপনিই আলমারি খোলেন এবং খুলে দুটি কাজ সারেন– তেত্রিশ হাজার টাকা এবং নীহারবাবুর গবেষণার নোটস হস্তগত করা। আমার বিশ্বাস এই জাল খামটা কাল তৈরি ছিল না; এটা আপনি রাতারাতি ছাপিয়ে নিয়েছেন। এটার হঠাৎ প্রয়োজন হল কেন সেটা জানতে পারি কি?

রণজিৎবাবু এবার ফেলুদার দিকে চোখ তুললেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, কাল বিকেলে দস্তুরের গলা শুনে নীহারবাবু ওকে সুপ্রকাশ চৌধুরী বলে চিনতে পেরেছিলেন! আমাকে বললেন, বিশ বছর পরে লোকটার লোভ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার কাগজপত্র ওই সরিয়েছে। তখন.... .

বুঝেছি। তখন আপনি ভাবলেন চুরিটা দস্তুরের ঘাড়ে চাপানোর এই সুযোগ। আপনিই তো পুলিশ চলে যাবার পর সেলেটেপ দিয়ে খামটাকে খাটের তলায় আটকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন–ঠিক এমনভাবে যাতে নিচু হলেই সেটা চোখে পড়ে তাই না?

রণজিৎবাবু প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

আমায় মাপ করবেন! আমি ফেরত দিয়ে দেব! টাকা আর কাগজপত্র আমি কালই ফেরত দিয়ে দেব, মিঃ মিত্তির! আমি...আমি লোভ সামলাতে পারিনি!। সত্যি বলছি, আমি লোভ সামলাতে পারিনি!

ফেরত আপনাকে দিতেই হবে। না হলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব সেটা বুঝতেই পারছেন।

আমি জানি, বললেন রণজিৎবাবু। তবে একটা অনুরোধ। নীহারবাবু যেন জানতে না পারেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি এ শক সহ্য করতে পারবেন না।

বেশ। তিনি জানবেন না এটা কথা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি এত ভাল ছাত্র হয়ে এটা কী করলেন?

রণজিৎবাবু ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা বলে চলল–

আমি আপনার প্রোফেসর বাগচীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনার উপর আমার সন্দেহ পড়ে চাবির গর্তের পাশের দাগ দেখে। চোর অত অসাবধানে কাজ করে না। বিশেষত যেখানে ঘরে লোক রয়েছে, দরজার বাইরে চাকর রয়েছে। যাই হাক, আপনার

ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল ছিল সেটা উনি বললেন। পরীক্ষা দিলে আপনি ফার্স্ট ক্লাস পেতেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। হঠাৎ পড়াশুনা বন্ধ করে সেক্রেটারির চাকরিটা নেওয়া কি শর্ট কাটে নোবেল প্রাইজের লোভ? রণজিৎবাবু ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় আর কথাই বলতে পারলেন না। ওঁর অবস্থা দেখে আমার মতো ফেলুদারও যে মায়া হচ্ছিল সেটা ওর পরের কথা থেকেই বুঝলাম।

আপনি এবার বাড়ি যেতে চান যেতে পারেন। কালকের জন্য আর অপেক্ষা করব না। আমরা। আপনি আজই আসল কাগজপত্র আর টাকা নিয়ে চলে আসুন। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে যাতে পুলিশ থাকে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতগুলো টাকা নিয়ে যাতায়াত করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সুবোধ বালকের মতো মাথা নাড়লেন রণজিৎ ব্যানার্জি।

সুবীরবাবু তাঁর ছেলে সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, সে যে চুরি করেনি, সেটা জেনে তাঁর নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। অন্তত তাঁর চেহারা দেখে আর গলার স্বরে তাই মনে হল। বললেন, একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কি?

নিশ্চয়ই, বলল ফেলুদা, সেটাই তো আসল কাজ।

সুবীরবাবুর পিছন পিছন আমরা নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

আপনারা এসেছেন? চেয়ারে শোয়া অবস্থায় প্রশ্ন করলেন নীহারবাবু।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলল ফেলুদা।আপনার গবেষণার কাগজপত্রগুলো ফেরত পেয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন?

ওগুলোর আর বিশেষ কোনও মূল্য নেই। আমার কাছে, নিচু গলায় ক্লান্ত ভাবে বললেন নীহারবাবু। এক দিনে একজন মানুষ এত ফ্যাকাসে হয়ে যেতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। কালকেও দেখে মনে হয়েছে ভদ্রলোক রীতিমতো শক্ত।

আপনার কাছে মূল্য না থাকলেও আমাদের কাছে আছে, বলল ফেলুদা।বিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে আছে।

সে আপনারা বুঝবেন।

আপনাকে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। কথা দিচ্ছি। এর পরে আর বিরক্ত করব না।

নীহারবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা স্নান হাসি দেখা দিল। বললেন, বিরক্ত আর করবেন কী করে? বিরক্তির অনেক উর্ধ্বে চলে গেছি যে আমি।

তা হলে বলি শুনুন। কাল টেবিলের উপর দেখেছিলাম ঘুমের ট্যাবলেট দশটা। আজও দেখছি। দশটা। আপনি কি কাল তা হলে ঘুমের ওষুধ খাননি?

না, খাইনি। আজ খাব।

তা হলে আসি আমরা!

দাঁড়ান।

নীহারবাবু তাঁর ডান হাতটা ফেলুদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দুজনের হাত মিলল। ভদ্রলোক ফেলুদার হাতটা বেশ ভাল করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন–

আপনি বুঝবেন। আপনার দৃষ্টি আছে।

বাড়িতে এসেও ফেলুদা গম্ভীর। কিন্তু তা বলে আমি অত রহস্য বরদাস্ত করব কেন? চেপে ধরে বললাম, ঢাকা ঢাক গুড গুড চলবে না। সব খুলে বলো।

ফেলুদা উত্তরে রামায়ণে চলে গেল। ওর সাসপেন্স বাড়ানোর কিছু কায়দা আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না।

রামকে বনবাসে পাঠানের ছদিন পর দশরথের হঠাৎ মনে পড়েছিল যে তিনি যুবরাজ অবস্থায় একটা সাংঘাতিক কুকীর্তি করে ফেলেছিলেন, আর সেই কারণেই আজ তাঁকে পুত্রশোক ভোগ করতে হচ্ছে। তোর মনে আছে সে কুকীর্তিটা কী?

রামায়ণটা টাটকা পড়া ছিল না, কিন্তু এ ঘটনাটা মনে ছিল। বললাম, অন্ধমুনির ছেলে রাত্রে নদীতে জল তুলিছিল কলসিতে। দশরথ অন্ধকারে শব্দ শুনে ভাবলেন বুঝি হাতি জল খাচ্ছে। উনি শব্দভেদী বাণ মেরে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছিলেন।

গুড। অন্ধকারে শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার এই ক্ষমতাটা ছিল দশরথের। নীহারবাবুরও ছিল।

নীহারবাবু।—আমি প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম।

ইয়েস স্যার, বলল ফেলুদা।-রাত জগতে হবে বলে ঘুমের ওষুধ খাননি। সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যান দস্তুর সুপ্রকাশের ঘরে। এই ঘরে এক কালে ওঁর ভাইপো থাকত। ঘর ওঁর চেনা। হাতে ছিল অস্ত্র-রুপো দিয়ে বাঁধানো জাঁদরেল লাঠি! খাটের কাছে গিয়ে লাঠি দিয়ে মোক্ষম ঘা। একবার নয়, তিনবার।

কিন্তু...কিন্তু...

আমার এখনও সাংঘাতিক গোলমাল লাগছে। এ সব কী বলছে ফেলুদা? লোকটা তো অন্ধ!

একটা কথা কি মনে পড়ছে না তোর? অসহিষ্ণুভাবে বলল ফেলুদা।সুখওয়ানি কী বলেছে দস্তুর সম্পর্কে?

বিদ্যুতের ঝলকের মতো কথাটা মনে পড়ে গেল।–

দস্তুরের নাক ডাকত!

এগজ্যাক্টলি! বলল ফেলুদা।-তার মানে বালিশের কোনখানে মাথা.কোন পাশে ফিরে রয়েছে, এ সবই বুঝতে পেরেছিলেন নীহারবাবু। যার শ্রবণশক্তি এত প্রখর, তার আর এর চেয়ে বেশি জানার কী দরকার? এক ঘায়ে যদি না হয়, তিন ঘায়ে তো হবেই!

আমি কিছুক্ষণ। হতভম্ব হয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে বললাম, এই অসমাপ্ত কাজটার কথাই কি বলেছিলেন নীহারবাবু? প্রতিশোধ?

প্রতিশোধ, বলল ফেলুদা, জিঘাংসা। অন্ধেরও দেহমানে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার করতে পারে এই প্রবৃত্তি। এই জিঘাংসাই তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। আর সেই কারণেই তিনি আইনের নাগালের বাইরে।

আরও সতেরো দিন বেঁচে ছিলেন নীহাররঞ্জন দত্ত। মারা যাবার ঠিক আগে তিনি উইল করে তাঁর গবেষণার কাগজপত্র আর জমানে টাকা দিয়ে গেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত মেধাবী সেক্রেটারি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।